মাহে রমযানের ২৭ আমল

শায়খ আহমাদুল্লাহ

মাহে রমযানের ২৭ আমল

শায়খ আহমাদুল্লাহ

মাহে রমযানে
২৭ আমল

শায়খ আহমাদুল্লাহ

প্রকাশক

দাওয়াহ ও গবেষণা বিভাগ, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

প্লট-৭০, রোড-৩, ব্লক-সি, আফতাবনগর, ঢাকা-১২১২।

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

শাবান, ১৪৪৬

পরিবেশক

naafiun.com

মূল্য

৬৫ টাকা

MAHE RAMZANER 27 AMAL by Shaikh Ahmadullah.

Published by Dawah and Research Department,

As-Sunnah Foundation.

সূচিপত্র

রমযান ইবাদতের ভরা বসন্ত ৫

রমযানের বিশেষ আমল ৬

১. চাঁদ দেখা ৭

২. রোযা রাখা ৯

৩. তারাবীহর সালাত আদায় করা ১১

৪. সাহরি খাওয়া ১২

৫. শেষ সময়ে সাহরি খাওয়া ১৩

৬. ইফতার করা ১৪

৭. ইফতার তাড়াতাড়ি করা ১৫

৮. ইফতারের দোয়া পড়া ১৬

৯. সাহরি ও ইফতারে খেজুর খাওয়া ১৭

১০. পাপকর্ম বর্জন করা ১৮

১১. অধিক পরিমাণে দোয়া করা ২০

১২. মিথ্যা কথা ও কাজ পরিহার করা ২২

১৩. অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করা ২৩

১৪. ভালো কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া ২৪
১৫. অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা ২৬
১৬. রোযাদারকে ইফতার করানো ২৮
১৭. বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা ৩০
১৮. কুরআন পরস্পরকে শোনানো ও বুঝে পড়া ৩২
১৯. দান-সদাকা করা ৩৪
২০. তাহাজ্জুদ ও ভোর রাতের দোয়া ৩৬
২১. উমরাহ করা ৩৮
২২. ইতিকাফ করা ৪০
২৩. শেষ দশকে ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া এবং রাত্রি জাগরণ ৪২
২৪. শেষ দশকে পরিবারকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা এবং স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ ৪৪
২৫. লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা ৪৫
২৬. লাইলাতুল কদরের বিশেষ দোয়া ৪৭
২৭. ফিতরা আদায় করা ৪৮

রমযান ইবাদতের ভরা বসন্ত

রমযান বছরের সবচেয়ে ফযিলতপূর্ণ মাস। এ মাস ইবাদত-বন্দেগির বসন্তকাল। এ মাসেই মানবতার মুক্তির সনদ কুরআনুল কারীম লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল হয়। এ মাসেই হেরা গুহায় প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ওহি নাযিলের ধারা শুরু হয়। এ মাসেই রয়েছে বছরের শ্রেষ্ঠতম রজনী—লাইলাতুল কদর। কুরআনুল কারীমে একমাত্র যে মাসের নাম ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো রমযান। এ মাসে রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত করা হয়, শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। রমযান শুরু হলে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন—'হে কল্যাণ-প্রত্যাশী, কল্যাণের পথে অগ্রসর হও। হে মন্দ পথের যাত্রী, থামো।' একটি মাসকে ঘিরে এতসব ঐশী আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো—যেন প্রত্যেক মুমিন এ মাসে ইবাদত-বন্দেগিতে অধিক মগ্ন হয় এবং নেক আমলের মাধ্যমে মহান রবের নৈকট্য অর্জন করে।

ব্যবসায়ীদের ব্যবসার যেমন বিশেষ বিশেষ মৌসুম থাকে, সারা বছরের ঘাটতি তারা মৌসুম এলে পুষিয়ে নেয়, ঈমানদারেরও তেমন আমলের ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার মৌসুম আছে। সেই মৌসুমে তারা সারা বছরের আমলের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়। সেই মৌসুম হলো রমযান। এজন্য রমযানকে ইবাদতের ভরা বসন্ত বলা হয়।

রমযানের ইবাদত-সাধনাকে সফল ও সার্থক করার পূর্বশর্ত হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো ও নির্দেশিত আমলের পূর্ণ অনুকরণ। এখানে আমরা এমন কিছু আমল তুলে ধরছি, যা রমযানের বিশেষ আমল হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এসব আমলের যথাযথ চর্চা আমাদের রমযান-সাধনাকে সার্থক ও মহিমান্বিত করবে ইনশাআল্লাহ।

রমযানের বিশেষ আমল

কুরআন-সুন্নাহতে রমযান মাসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, সেসব আমলকে আমরা এখানে রমযানের বিশেষ আমল হিসেবে উল্লেখ করেছি। যদিও এসব আমলের অনেকগুলোই রমযান ছাড়াও পালনীয়।

১. চাঁদ দেখা

শাবান মাসের ২৯ তারিখে পশ্চিম আকাশে চাঁদ অনুসন্ধান করা রমযানের প্রথম আমল। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

> অর্থ : তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ উদযাপন কর।[1]

ইসলামের অনেক ইবাদতের সাথেই হিজরি পঞ্জিকার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যেমন : হজ, যাকাত, রমযানের সিয়াম, আইয়ামে বীযের সিয়াম, ঈদ ইত্যাদি। এসব ইবাদত যেন যথা সময়ে পালন করা যায়, তাই হিজরি সনের তারিখ সংরক্ষণ করা ফরজে কিফায়াহ। সমাজের কিছু লোক এ কাজ আঞ্জাম দিলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যায়। আর কেউ না করলে সবাই গুনাহগার হয়। তবে সামগ্রিকভাবে চাঁদ দেখা ফরজে কিফায়াহ হলেও সাধারণভাবে চাঁদ দেখা রাসুল (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। যে ব্যক্তি চাঁদ দেখার চেষ্টা করবে, সে সওয়াব লাভ করবে, চাই সে চাঁদ দেখতে পাক বা না পাক।

চাঁদ দেখার পর বিশেষ দোয়া পাঠ করাও সুন্নাহ। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) যখন চাঁদ দেখতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

> অর্থ : হে আল্লাহ, আমাদের ওপর এ নতুন চাঁদকে উদিত করুন বরকত ও ঈমানের সঙ্গে এবং শান্তি ও ইসলামের

1. সহিহ বুখারি, ১৯০৯; সহিহ মুসলিম, ১০৮১

> সঙ্গে। (হে চাঁদ,) তোমার পালনকর্তা ও আমার পালনকর্তা হলেন আল্লাহ।[2]

অতএব, যারা চাঁদ দেখতে পাবেন, তারা উক্ত দোয়াটি পাঠ করবেন। এটি রাসুলের (সা.) আমল।

এক সময় রমযান ও ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিপুল উদ্দীপনা লক্ষ করা যেত। প্রত্যেকে আপন আপন জায়গা থেকে চাঁদ দেখার চেষ্টা করতেন। কে কার আগে চাঁদ দেখতে পারে তা নিয়ে কিশোরদের মাঝে প্রতিযোগিতা লেগে যেত। কিন্তু বর্তমান অবস্থা ভিন্ন। শহর-গ্রাম কোথাও আর চাঁদ দেখাকে কেন্দ্র করে আগের সেই আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। নতুন চাঁদ ওঠার স্নিগ্ধ সন্ধ্যাগুলোয় এখন আর আমাদের দৃষ্টি আকাশে থাকে না, থাকে মোবাইলের স্ক্রিনে। আজকাল আমরা আকাশে চাঁদ খুঁজি না। আমরা চাঁদ খুঁজি ফেসবুকে। ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নির্ভরযোগ্য সংবাদ গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু শাবানের শেষ দিবসে পশ্চিম আকাশে চাঁদ অনুসন্ধান করা মুসলিমদের দায়িত্ব। এ দায়িত্বের প্রতিও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া আকাশে চাঁদ দেখার পরিবর্তে সবাই যদি শুধু খবরের অপেক্ষায় বসে থাকি, তবে চাঁদ দেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হাতেগোনা অল্পসংখ্যক মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, যা কাম্য হতে পারে না।

সুতরাং চাঁদ দেখার এ বিলুপ্তপ্রায় সুন্নাহকে পুনর্জীবন দিতে হিজরি বর্ষের প্রত্যেক মাসের শেষে চাঁদ তালাশ করতে হবে। বিশেষভাবে, রমযানের সিয়াম পালনের প্রয়োজনে এ মাসের প্রথম আমল হিসেবে চাঁদ দেখার চেষ্টা করতে হবে।

2 মুসনাদে আহমাদ, ১৩৯৭ ; সুনান তিরমিযি, ৩৪৫১

২. রোযা রাখা

সাওম বা রোযা রাখা রমযানের প্রধান আমল। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর রমযানের রোযা রাখা ফরজ। মহান আল্লাহ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।[3]

রোযা শুধু ফরজ ইবাদতই নয়, এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

অর্থ : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর স্থাপিত। ১. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল—এ কথার সাক্ষ্য দান করা। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হজ করা। ৫. রমযানের সিয়াম পালন করা।[4]

---

3. সূরা বাকারা, ১৮৩
4. সহিহ বুখারি, ৮

অতএব, রমযানে সিয়াম পালন করা ফরজ। গ্রহণযোগ্য ওজর ব্যতীত সিয়াম ছেড়ে দেওয়া কবীরা গুনাহ। রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি (শরীয়াহগ্রাহ্য) ওজর ও অসুস্থতা ছাড়া রমযানের একটি সিয়ামও ছেড়ে দেবে, সে সমগ্র জীবন সিয়াম পালন করেও তার হক আদায় করতে পারবে না। সিয়ামের মর্যাদা ও ফযিলত অপরিসীম। কুরআন-হাদিসে যে সকল ইবাদতের সবচেয়ে বেশি ফযিলত ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, সিয়াম তার মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য আমলের সওয়াব নির্ধারিত। কিন্তু সিয়াম এর ব্যতিক্রম। সিয়ামের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্ দান করে বান্দাকে চমৎকৃত করবেন।[৫]

৫. সহিহ বুখারি, ১৮৯৪

৩. তারাবীহর সালাত আদায় করা

তারাবীহর সালাত রমযানের তৃতীয় বিশেষ আমল। রমযানে ইশার পর বিতরের পূর্বে যে সালাত আদায় করা হয় সেটাকে তারাবীহর সালাত বলা হয়। রাসুল (সা.) নিয়মিত তারাবীহর সালাত আদায় করেছেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিয়েছেন। সাহাবাগণও তারাবীহর বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

> অর্থ : যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় সালাত আদায় করবে, তার পেছনের সকল (সগিরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৬]

সিয়ামের পর রমযানের একান্ত বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো তারাবীহ। এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর তারাবীহর সালাতে একবার কুরআনুল কারীম খতম করা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম নিয়মিত তারাবীহ সালাতে রাতভর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাই রমযানের রোযা রাখার পাশাপাশি প্রত্যেক রাতে ধীরস্থিরভাবে কুরআন খতমের উদ্দেশ্যে তারাবীহর সালাত আদায় করা উচিত। তারাবীহতে তাড়াহুড়ো করা আমাদের খারাপ রীতিগুলোর একটি। এই রীতি ত্যাগ করা জরুরি।

৬. সহিহ বুখারি, ৩৭; সহিহ মুসলিম, ৭৫৯

৪. সাহরি খাওয়া

রমযানের চতুর্থ বিশেষ আমল হলো সাহরি খাওয়া। সাহরি খাওয়া সুন্নাহ। যদিও সাহরি খাওয়া ছাড়াও রোযা শুদ্ধ হয়ে যায়, তবু সুন্নাহ পালনের সওয়াব ও বারাকাহ লাভের আশায় অল্প পরিমাণ হলেও সাহরি গ্রহণ করা উচিত। রাসুল (সা.) বলেন:

تَسَحَّرُوْا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً

> অর্থ : তোমরা সাহরি খাও। কারণ, সাহরির মধ্যে বরকত রয়েছে।[৭]

ইসলাম মানুষের জাগতিক প্রয়োজনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে, উপর্যুক্ত হাদিসের মাধ্যমে তা আমরা অনুভব করতে পারি। রোযা রেখে বান্দা সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকে, ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এই কষ্ট যেন সীমা অতিক্রম না করে, সে জন্য সাহরির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে—যাতে সাহরি খেয়ে আমরা সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার প্রস্তুতি নিতে পারি।

সাহরি শুধু জাগতিক খাবারই নয়; ইসলাম এটিকে ইবাদতে পরিণত করেছে। আমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য খাবার খাই, সেই খাবার খাওয়ার মাধ্যমেও সওয়াব অর্জিত হয়। শুধু তা-ই নয়, রাসুল (সা.) সাহরিকে বলেছেন বারাকাহ, অর্থাৎ মহান আল্লাহ এর মাঝে কল্যাণ ও বারাকাহ রেখেছেন। এটি আমাদের শারীরিক ও আত্মিক বারাকাহর মাধ্যম।

অতএব, রমযান মাসে সাহরি খাওয়ার সুন্নাহর প্রতি আমাদের আমল করা উচিত। তবে এ সুন্নাহ পালনের জন্য পেট ভরে খাওয়া আবশ্যক নয়; বরং সাহরির নিয়তে সামান্য কিছু খেলেও এ সুন্নাহর ওপর আমল হয়ে যাবে।

---

৭. সহিহ বুখারি, ১৯২৩

৫. শেষ সময়ে সাহরি খাওয়া

সাহরি খাওয়া একটি সুন্নাহ, আর রাতের শেষাংশে সাহরি খাওয়া আরেকটি স্বতন্ত্র সুন্নাহ। মধ্য রাত থেকে সুবহে সাদিক (ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া) পর্যন্ত সাহরি খাওয়ার সময়। মধ্য রাতের পর যে কোনো সময় সাহরি খেলেই সাহরি খাওয়ার সুন্নাহর ওপর আমল হয়ে যায়। তবে সাহরি রাতের শেষ প্রহরের শেষভাগে খাওয়া উত্তম। রাসুল (সা.) রাতের একেবারে শেষভাগে সাহরি করতেন। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ও যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) একসাথে সাহরি খেলেন, যখন খাওয়া শেষ হলো, তখন রাসুল (সা.) (ফজরের) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের সাহরি শেষ এবং সালাত শুরুর মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, একজন লোক যতটুকু সময়ে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে, ততটুকু সময়।[৪]

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীজি (সা.) রাতের একেবারে শেষাংশে অর্থাৎ সুবহে সাদিক হওয়ার আগ মুহূর্তে সাহরি শেষ করতেন। এরপর ফজরের আযান হতো এবং আযানের পরপরই তিনি ফজরের নামাজ আদায় করতেন।

অতএব, সাহরি রাতের একেবারে শেষাংশে খাওয়া সুন্নাহ। তবে খেয়াল রাখতে হবে, শেষাংশে খেতে গিয়ে যেন সুবহে সাদিক উদিত হয়ে না যায়। সাহরি অবশ্যই সুবহে সাদিক বা ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে শেষ করতে হবে। সুবহে সাদিকের পর সাহরি খেলে রোযা হবে না। এ জন্য সতর্কতামূলক সাহরি ও সুবহে সাদিকের মধ্যে অতি সামান্য হলেও ব্যবধান রাখতে হবে।

---

৪. সহিহ বুখারি, ৫৭৬

৬. ইফতার করা

ইফতার মানে নাশতা করা। মানুষ সাধারণ সময়ে রাতভর ক্ষুধার্ত থেকে সকালে নাশতা করে, আর রমযানে দিনভর উপবাস থেকে সন্ধ্যায় নাশতা করা হয়। তবে সাধারণ নাশতা আর রমযানের ইফতারের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সাধারণ নাশতা কেবল একটা মুবাহ্ বা জায়েয কাজ, বিপরীতে সিয়াম পালন শেষে ইফতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। ফলে সুন্নাহ্ পালন ও ইফতারের উদ্দেশ্যে পানাহার করলে সওয়াব হয়। কেউ ইফতার না করলেও সিয়াম হয়ে যাবে, তবে ইফতারের সুন্নাহ থেকে বঞ্চিত হবে। এ জন্য সূর্যাস্তের পর ইফতারের নিয়তে সামান্য কিছু হলেও মুখে দেওয়া উচিত। তাছাড়া ইফতারের সময় অনির্বচনীয় এক আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়, যা অন্য কোনো খাবার গ্রহণের সময় অনুভূত হয় না। এ সময় রোযাদারগণ আল্লাহর আনুগত্যের এক পরম পবিত্র দৃশ্যের জন্ম দেন। পেটে ক্ষুধা, বুকে তৃষ্ণা, হাতে সুস্বাদু খাবার ও সুপেয় পানি, তবু অপেক্ষা কেবল রবের নির্দেশের। অন্য কোনো দৃশ্যের সঙ্গে এই পবিত্র মুহূর্তের তুলনা চলে না। মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি ইবাদতের মধ্যেও রেখেছেন পরম আনন্দ ও সীমাহীন তৃপ্তি। বিষয়টিকে প্রিয় নবী (সা.) ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

সিয়ামপালনকারীর জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি হলো ইফতারের সময়, অপরটি হবে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়; যখন তিনি তাকে এর বিনিময় দান করবেন।[৯]

---

৯. সহিহ বুখারি, ৭৪৯২; সহিহ মুসলিম, ১১৫১

৭. ইফতার তাড়াতাড়ি করা

ইফতার করা একটি সুন্নাহ, তাড়াতাড়ি ইফতার করা আরেকটি সুন্নাহ। বেশ কয়েকটি হাদিসে সময় হওয়ামাত্র বিলম্ব না করে ইফতার করার নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তাড়াতাড়ি ইফতারকারীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন। অনেকে সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার পরও চারপাশ অন্ধকার হওয়ার অপেক্ষা করেন। তারা মনে করেন, যত বিলম্বে ইফতার করা হবে, রোযা ততটা নিশ্চিত, সন্দেহমুক্ত এবং অধিকতর শুদ্ধভাবে আদায় হবে। এটা ভুল ধারণা। রাসুল (সা.) বলেছেন:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

> অর্থ : যতদিন পর্যন্ত আমার উম্মত দ্রুততম সময়ে ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের সঙ্গে থাকবে।[10]

তবে সাহরির মতো ইফতারের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য যে, তাড়াতাড়ি ইফতার করতে গিয়ে যেন সূর্যাস্তের আগেই ইফতার না হয়ে যায়। বরং সূর্যাস্তের সময় নিশ্চিত হওয়ার পরই ইফতার করতে হবে। সূর্যাস্ত নিশ্চিতের পর বিলম্ব করা সুন্নাহর পরিপন্থি।

10 সহিহ বুখারি, ১৯৫৭

৮. ইফতারের দোয়া পড়া

ইফতারের সময়টি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় সাধারণভাবে দোয়া কবুলের কথা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করার পর ইফতার শেষে বিশেষ মাসনুন দোয়া পড়াও সুন্নাহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইফতারের সময় এ দোয়া নিবেদন করতেন:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

> অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ চান তো প্রতিদানও অবধারিত হয়েছে।[11]

ইফতারের আরেকটি দোয়া বেশ প্রচলিত। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

> অর্থ : হে আল্লাহ, আমি একমাত্র আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া রিজিক দ্বারা ইফতার করেছি।[12]

এ দোয়াটির সনদ কিছুটা দুর্বল হলেও আমলযোগ্য। তাই, সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর ইফতারের ব্যস্ততায় আমরা যেন ইফতারের দোয়া পড়তে ভুলে না যাই। কারণ, ইফতার করা একটি সুন্নাহ, আর ইফতারের দোয়া নিবেদন করা আরেকটি সুন্নাহ।

সাহরি ও ইফতারকে ঘিরে কয়েকটি সুন্নাহ আছে। মুমিন প্রতিটি সুন্নাহ পালন করে পৃথক পৃথক সওয়াব ও বিনিময়ের হকদার হতে পারেন।

---

11 সুনান আবু দাউদ, ৩৩৫৭

12 সুনান আবু দাউদ, ৩৩৫৮

৯. সাহরি ও ইফতারে খেজুর খাওয়া

ইফতারে খেজুর খাওয়া সুন্নাহ, এটা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ইফতারের মতো সাহরিতেও যে খেজুর খাওয়া সুন্নাহ, এটা বেশিরভাগ মানুষই জানে না। রাসুল (সা.) বলেন:

نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

| অর্থ : মুমিনের জন্য উত্তম সাহরি হলো খেজুর।[13] |

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেছেন: নবী (সা.) মাগরিবের সালাত আদায় করার আগে কয়েকটি আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আধা-পাকা খেজুর না থাকলে কয়েকটি পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর তাও না থাকলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।[14]

খেজুর অত্যন্ত খাদ্যশক্তি ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাবার। সাহরি ও ইফতারে খেজুর খেলে দিনভর সিয়াম পালন করা সহজ হয়। আমরা ইফতার ও সাহরিতে অন্যান্য খাবার খেলেও সুন্নাহ পালনের উদ্দেশ্যে দু-একটি খেজুর খেয়ে নিতে পারি। এতে রাসুলের (সা.) অনুসরণে খেজুর খাওয়ার জন্য বিশেষ সওয়াব লাভ হবে ইনশাআল্লাহ।

13. সহিহ ইবনু হিব্বান, ৩৪৭৫

14 সুনান আবু দাউদ, ২৩৫৬

১০. পাপকর্ম বর্জন করা

হারাম ও পাপকর্ম সব সময়ের জন্যই নিষিদ্ধ। বিশেষভাবে রমযান মাসে সব ধরনের পাপকর্ম পুরোপুরি বর্জন করা উচিত। রমযানে পাপমোচনের এতবড় সুযোগ আসার পরও বান্দা পাপে ডুবে থাকবে, এটা তো ভাবাই যায় না। কেননা, এ মাসে শয়তান বন্দি থাকে, বন্ধ থাকে জাহান্নামের দরজা, খুলে রাখা হয় জান্নাতের দুয়ার। রমযানকে ঘিরে আসমানের এই সকল আয়োজন মূলত আমাদের জন্য। আমরা যেন সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে মহান রবের আরও কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি। এরপরও আমরা যদি সারা বছরের মতো রমযানেও উদাসীনতার পরিচয় দিই, তবে তা হবে মাহে রমযানের প্রতি চরম অবহেলা ও অপমান। এর ফলে আমরা রাসুল (সা.)-এর সেই সতর্কবার্তার আওতায় পড়ব, যেখানে তিনি বলেছেন, ধ্বংস হোক সে, যে রমযান পাওয়ার পরও নিজের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না।[১৫]

রমযানের রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা। কুরআন-হাদিসের ভাষায় রোযাকে সাওম বা সিয়াম বলা হয়েছে। আর সাওম বা সিয়াম শব্দের অর্থ বিরত থাকা। সিয়াম পালনের সময় আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে আমাদেরকে পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হয়। পাশাপাশি সামগ্রিক জীবনে সকল হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাও দেয় সিয়াম। অতএব, অন্য সাধারণ সময়ে আমরা যেমন হারাম ও পাপাচার বর্জন করে চলি, রমযানেও এর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

কেউ যদি রোযা রাখার পরও পাপাচার বর্জন করতে না পারে, তবে তার সিয়াম অর্থবহ ও সার্থক হবে না। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন:

---

১৫. সহিহ ইবনি হিব্বান, ৪০৯

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।[১৬]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে রোযার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। সেটা হলো তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া অর্জন রোযার প্রধান উদ্দেশ্য। আর তাকওয়া অর্জনের প্রধান শর্তই হলো পাপাচার বর্জন। সুতরাং কেউ যদি রোযা রেখেও পাপ বর্জন করতে না পারে, তবে তিনি রোযার প্রধান উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হলেন। শুধু তা-ই নয়, রোযা রেখেও যারা পাপ বর্জন করতে পারে না, তাদের রোযাকে রাসুল (সা.) স্রেফ উপবাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুল (সা.) বলেন:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ

অর্থ : অনেক সিয়ামপালনকারী আছে (সিয়াম রেখে পাপাচার বর্জন না করার কারণে) যাদের সিয়ামের বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না।[১৭]

অতএব, রমযানে আমাদেরকে সব ধরনের পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বিশেষ মনযোগী হতে হবে। এটা মুমিনের জন্য রমযানের বিশেষ কর্মসূচি।

১৬. সূরা বাকারা, ১৮৩

১৭. সুনান ইবনে মাজাহ, ১৬৯০

১১. অধিক পরিমাণে দোয়া করা

দোয়া ইবাদতের সারনির্যাস। হাদিসে দোয়াকেই ইবাদত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই একজন মুমিন সর্বদা দোয়ায় মশগুল থাকবেন, বিশেষত রমযান মাসে তার দোয়ার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ মাহে রমযানে দোয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মহান আল্লাহ্ রোযাদারের দোয়া কবুল করেন। রাসুল (সা.) বলেন, তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, তাদের একজন হলেন রোযাদার। ইফতারের আগ পর্যন্ত তার দোয়া কবুল হতে থাকে।[১৮]

অতএব, রোযাদার ব্যক্তির বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। দোয়া প্রত্যেক মুমিনের নিত্যসঙ্গী। মুমিন যেন সব সময় দোয়া করতে পারে, সে জন্য ইসলামী শরিয়ায় বিনা ওজুতেও দোয়া করার বিধান রয়েছে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে; এমনকি হাঁটাচলা অবস্থায়ও দোয়া করা যায়। সাধারণ অবস্থায় হাত তুলে দোয়া করা মুস্তাহাব হলেও হাত তোলা ছাড়াও দোয়া করা যায়; এমনকি মনে মনেও আল্লাহর নিকট দোয়া করা যায়। তাই রোযাদার ব্যক্তির রমযান মাসে বিশেষ মনযোগের সাথে নিয়মতান্ত্রিক দোয়ার পাশাপাশি কাজের ফাঁকে, চলতে-ফিরতে মনে মনে দয়াময় আল্লাহর কাছে দোয়া নিবেদন করা উচিত।

রোযাদারের দোয়া দিনভর কবুল হলেও ইফতারের সময় দোয়া কবুলের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রাসুল (সা.) বলেন:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ

১৮. সুনান তিরমিযি, ৩৫৯৮

> অর্থ : ইফতারের সময় রোযাদারের একটি দোয়ার সুযোগ রয়েছে, যা কখনোই প্রত্যাখ্যাত হয় না (অর্থাৎ অবশ্যই কবুল করা হয়)।[১৯]

ইফতারের পূর্বক্ষণ দোয়া কবুলের সুবর্ণ সময়। অথচ ইফতার তৈরি ও পরিবেশনে এই সময়টা আমরা নষ্ট করে ফেলি। এটা এদেশের প্রায় প্রত্যেক ঘরের চিত্র। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত। আমরা দিনভর কাজের ফাঁকে দোয়ায় মশগুল তো থাকবই, পাশাপাশি ইফতারের সময়ও বিশেষভাবে দোয়ায় মনোনিবেশ করব। আমরা যদি দিনের শুরুতেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখি, ইফতার প্রস্তুতের পর দোয়ার জন্য বিশেষ সময় রাখি এবং সেভাবেই যদি কাজ গুছিয়ে রাখি—তবে এটা কঠিন কিছু নয়। ইফতারের পূর্বক্ষণে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনার এই সুবর্ণ সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করা উচিত নয়।

১৯. সুনান ইবনে মাজাহ, ১৭৫৩

১২. মিথ্যা কথা ও কাজ পরিহার করা

কথা ও কাজে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় বিষয়। এ জন্য ইসলাম সর্বাবস্থায় মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। শুধু ইসলামেই নয়, অন্যান্য সকল ধর্ম এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মিথ্য জঘন্য অপরাধ। মিথ্যা জগতের জঘন্যতম পাপ হওয়ার কারণে সাধারণ সব গুনাহ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি বিশেষভাবে মিথ্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি গভীরভাবে রোযার বিধানের প্রতি লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাব, সততা চর্চার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ সিয়াম। কারণ, সিয়াম মানে বিরত থাকা। সিয়ামরত ব্যক্তির গোপনে পানাহার করার অনেক সুযোগ থাকে। অথচ প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং তীব্র পিপাসা সত্ত্বেও তিনি গোপনে কোনো খাবার গ্রহণ করেন না। কারণ, সিয়ামরত অবস্থায় পানাহার না করার ব্যাপারে তিনি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এটাই একজন রোযাদারের সততার পরিচয়। এভাবেই আমরা একজন রোযাদারের জীবনে সততা চর্চার জ্বলজ্যান্ত বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। এটাই সিয়ামের শিক্ষা ও সার্থকতা। সেজন্য রমযান মাসকে সার্থক করতে অন্যান্য পাপ বর্জনের পাশাপাশি মিথ্যা পরিত্যাগ করতে ইসলাম বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ بِاَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

> অর্থ : যে ব্যক্তি (সিয়াম রেখে) মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়ল না, তার পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই।[20]

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তার এ রোযার কোনো মূল্য নেই। সুতরাং সিয়ামরত অবস্থায় অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি বিশেষভাবে মিথ্যা কথা ও প্রতারণা ইত্যাদি ত্যাগ করে চলতে হবে।

---

20. সহিহ বুখারি, ১৯০৩

১৩. অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করা

রমযান আত্মশুদ্ধির মাস। মহান আল্লাহ্ মাহে রমযানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমাদের আত্মসংশোধনের নানাবিধ উপযোগিতা ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তারই অংশ হিসেবে এ মাস জুড়ে সাধারণ গুনাহ্ পরিত্যাগের পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক মন্দ স্বভাব ত্যাগের জোরালো নির্দেশনা দিয়েছেন। রমযানে অশ্লীল কথা ও কাজ বর্জন এবং ঝগড়া-বিবাদ পরিহার সেই বিশেষ নির্দেশনার অংশ। রাসুল (সা.) বলেন: যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন অশ্লীল কাজ বা ঝগড়া-বিবাদ না করে। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে কিংবা তার সঙ্গে বিবাদ করতে আসে, তবে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার।[21]

অতএব, রমযান মাসকে অর্থবহ্ করতে সব ধরনের অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকতে হবে। কোনো রোযাদার নিজে উপযাচক হয়ে ঝগড়া তো করবেই না, কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলেও নিজেকে সংযত রাখবে। অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিজেকে সংযত রাখার এই নির্দেশনা শুধু অফলাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অনলাইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেকে সামাজিক জীবনে সংযমের পরিচয় দিলেও অনলাইনে তিনি সংযম ধরে রাখতে পারেন না। এটা বর্তমান সময়ের দুঃখজনক বাস্তবতা। অনলাইন কিংবা অফলাইন কোথাও যেন আমাদের কারণে রমযানের পবিত্রতা নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এ জন্য রমযান মাসে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, সোশ্যাল মিডিয়া একদিকে যেমন আমাদেরকে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে, তেমনি ঝগড়া-বিবাদ, বিতর্ক-বচসার দুয়ার খুলে দেয়। এতে গুনাহের পাশাপাশি সময়ের অপচয় ও ইবাদতের নূরানি আবহ্ নষ্ট হয়।

21 সহিহ্ বুখারি, ১৯০৪

১৪. ভালো কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া

রমযান নেক আমলের মাস। সারা বছরের আমলের ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার মাস। এই সুযোগ বছরের বাকি এগারো মাসে পাওয়া যায় না। এ কারণে রমযানে সাধারণ নেক আমলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। রাসুল (সা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রমযান মাসে একটি নফল ইবাদত করল, সে যেন অন্য মাসের একটি ফরজ ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করল, সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করল।[22]

এ হাদিসের সনদ কিছুটা দুর্বল, তবে ফযিলত হিসেবে উল্লেখযোগ্য। রমযানের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল (সা.) আরও ইরশাদ করেন, রমযানের শুরুতে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করতে থাকেন:

يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ

| অর্থ : হে কল্যাণ-প্রত্যাশী, সামনে অগ্রসর হও।[23] |

এই হাদিসের মাধ্যমেও মাহে রমযানে নেক আমলের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়ার তাৎপর্য ও গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। একটি মাস কতটা বরকতপূর্ণ ও ফযিলতপূর্ণ হলে মহান আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে আমাদেরকে কল্যাণের পথে ধাবিত হতে উদ্বুদ্ধ করেন! ফেরেশতার এই ঘোষণা আমাদেরকে বারবার এ কথাই বলে যায়, ভালো কাজ করার মৌসুম এসেছে। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এখন সময় নেক আমল করার। এখন সময় জান্নাতের পথে এগিয়ে যাওয়ার। এরপরও যদি আমরা উদাসীন থাকি, হেলায়

22 সহিহ ইবনে খুজাইমা, ১৮৮৭

23. সুনান তিরমিযি, ৬৮২

হারিয়ে ফেলি এই সুবর্ণ সুযোগ, তবে আমাদের চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে!

অন্যান্য সময় আমরা নিয়মিত যে আমল করি, রমযানে তার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে মিসওয়াকের কথা বলা যায়। মিসওয়াক রাসুল (সা.)-এর সার্বক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। রাসুল (সা.) বলেন, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়।[24]

অনেকে মনে করেন, সিয়ামরত অবস্থায় মিসওয়াক করা যায় না। এটা ভুল ধারণা। অন্যান্য সময়ের মতো রোযা রেখেও মিসওয়াক করা যায়। আমের ইবনে রবিআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে রোযাদার অবস্থায় এতবার মিসওয়াক করতে দেখেছি, যা আমি গুণে শেষ করতে পারব না।[২৫]

তাই আসুন, এই রমযানে আমরা আমল-ইবাদত ও ভালো কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিই, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সঙ্গে আদায় করি, মিসওয়াক করি, অন্যান্য নফল ও নেক কাজে নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় রত হই।

24 সহিহ ইবনি খুযাইমা, ১৩৫

২৫. সুনান তিরমিযি, ৭২৫

১৫. অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা

ইস্তিগফার মুমিনের নিত্যসঙ্গী। রাসুল (সা.) নিষ্পাপ তথা মাসুম ছিলেন। তার আমলনামায় পূর্বাপর কোনো গুনাহ ছিল না। তারপরও প্রতিদিন তিনি সত্তরের অধিক বার ইস্তিগফার করতেন। এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পাপমোচন হয়। আল্লাহর প্রিয় হয়ে ওঠা যায়। আর একারণেই আমলের ভরা মৌসুম রমযানেও আমাদের অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা উচিত। এটি রমযানের আরেকটি বিশেষ আমল। রমযানে নিজের পাপমোচনের জন্য বারবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কারণ, মাহে রমযান এসেছেই আমাদের গুনাহ মাফ করানোর জন্য, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। রাসুল (সা.) বলেছেন:

وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ

> অর্থ : রমযানের প্রতি রাতে আল্লাহ অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।[২৬]

অতএব, রমযান মাসে নিজেদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করাতে তৎপর হতে হবে। অশ্রুসিক্ত প্রার্থনার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করতে হবে। রমযান পাওয়ার পরও আমলনামায় আগের মতোই গুনাহ বহাল থাকা চরম দুর্ভাগ্য। হাদিসে এসেছে, একবার জিবরাইল (আ.) রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ

২৬. সুনান তিরমিযি, ৬৮২

> অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রমযান পেল, অথচ তার গুনাহ ক্ষমা করা হলো না, সে ধ্বংস হোক; তখন রাসুল (সা.) বললেন, আমীন।[২৭]

উল্লিখিত হাদিস এটাই প্রমাণ করে, রমযান পেয়েও যারা গুনাহ মাফ করাতে পারবে না, তারা জিবরাইল (আ.) ও রাসুল (সা.) উভয়ের বদদোয়ার পাত্র হবে। উম্মতের প্রতি প্রিয় রাসুলের দরদ ছিল প্রবাদতুল্য। তিনি ছিলেন দয়ার নবী। তার হৃদয় ছিল কোমলতায় পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ তাকে জগৎসমূহের রহমত আখ্যা দিয়েছেন। উম্মতের প্রতি তার ভালোবাসার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে সীরাতের পাতায় পাতায়। অথচ সেই তিনি এমন রোযাদারের জন্য জিবরাইলের (আ.) বদদোয়ায় আমীন বলেছেন, যে রোযাদার রোযার মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা করাতে পারে না। এতেই উপলব্ধি করা যায়, রমযান পেয়েও গুনাহ ক্ষমা করাতে না পারার বিষয়টি কতটা গুরুতর। তাই যে কোনো মূল্যে রমযানে আল্লাহর কাছে রোনাজারি করে গুনাহ ক্ষমা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ আদায় করে নিতে হবে।

২৭. সহিহ ইবনে হিব্বান, ৪০৯

১৬. রোযাদারকে ইফতার করানো

রোযাদারকে ইফতার করানো মাহে রমযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। রাসুল (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে রোযাদারের অনুরূপ সওয়াব পাবে। কিন্তু এতে রোযাদারের সওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না।[28]

আপনি চাইলেও এক রমযানে ত্রিশটির অধিক রোযা রাখতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি চান, এক রমযানে ষাটটি রোযার সওয়াব লাভ করতে পারেন, সেই সুযোগ ইসলামে আছে। তার উপায় হলো নিজের রোযার পাশাপাশি ত্রিশজন রোযাদারকে ইফতার করানো। এভাবে সামর্থ্য থাকলে আপনি অসংখ্য মানুষের ইফতারের দায়িত্ব নিয়ে এক রমযানে অসংখ্য রোযার সওয়াব লাভ করতে পারেন। আবার ইফতার করানো বলতে যে প্লেটভরতি রসনাবিলাসী খাবার খাওয়াতে হবে, এমনও কিন্তু নয়। সামার্থ্যভেদে আপনি যদি এক গ্লাস পানি কিংবা একটি খেজুরও খাওয়ান, এতেও আপনি বাড়তি রোযার সওয়াব পাবেন। সুবহানাল্লাহ! রমযান আসেই যে নেক আমলের ফসলে আমাদের হিসাবের খাতা ভরিয়ে দিতে, ইফতারের বাড়তি সওয়াব তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রত্যেক রমযানেই আমাদের দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অবিশ্বাস্য রকমের বেড়ে যায়। এমন দুর্মূল্যের বাজারে অভাবী রোযাদারের কষ্টের ভার লাঘব করতে ইফতার করানোর এই সুন্নত অত্যন্ত উপযোগী আমল। এ জন্য আমরা প্রতিবেশী দরিদ্র রোযাদারের ঘরে দশদিন, বিশদিন কিংবা এক মাসের ইফতার কিনে পাঠিয়ে দিতে পারি। ধরুন, আপনার এলাকার কোনো এক বস্তিতে একজন রিকশাচালক

---

28 সুনান তিরমিযি, ৮০৭

বাস করেন। রমযানে তিনি পরিবার নিয়ে সীমাহীন দুশ্চিন্তায় আছেন। তার রোযাদার ছোট ছোট সন্তানেরা মজাদার ইফতার খাওয়ার বায়না ধরেছে। কিন্তু কয়েক পদের ইফতার কেনার সামর্থ্য রিকশাচালক ভাইটির নেই। সন্তানদের সামনে তিনি পরাজিত মুখে মন খারাপ করে বসে আছেন। এমন সময় আপনি এক মাসের ব্যাগভরতি ইফতার নিয়ে তার বস্তিতে উপস্থিত হলেন। একবার কল্পনা করুন, ঠিক সেই মুহূর্তে ওই রিকশাচালক, তার স্ত্রী এবং সন্তানদের মনের অবস্থা কেমন হবে! আনন্দে নিশ্চয় তারা কেঁদে ফেলবে এবং আপনার জন্য হৃদয় উজাড় করে দোয়া করবে। একটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভাবী রোযাদার পরিবারের পাশে দাঁড়াবার যে আনন্দ, পৃথিবীতে এর কোনো তুলনা হয় না। এর মাধ্যমে আপনি পরিবারটির রোযার সওয়াব তো পাবেনই, পাশাপাশি অপার্থিব এক সুখে আপনার হৃদয় ভরে উঠবে। এ জন্য সামর্থ্যবানদের রমযানের এই বিশেষ আমলের প্রতি এগিয়ে আসা উচিত। আবার যাদের সামর্থ্য সীমিত, তারা সামান্য অর্থ খরচ করেও এ ফযিলত লাভ করতে পারেন। উদাহরণত, ইফতারের আগ মুহূর্তে কোনো রোযাদার পথচারী বা বাসযাত্রীর হাতে এক বোতল পানি এগিয়ে দিলেন। আশা করা যায়, এতেও আপনি বাড়তি রোযার সওয়াব পাবেন। পাশপাশি এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

১৭. বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা

রমযান কুরআনের মাস। এ মাসেই লওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে কুরআন নাযিল হয়। আবার রাসুল (সা.)-এর ওপর কুরআন নাযিলের যে ধারা, তার সূচনা হয় রমযান মাসে। শুধু তাই নয়, এ মাসেই জিবরাইল (আ.) ও রাসুল (সা.) কুরআন শোনাশুনি করতেন। কাজেই একথা বলাই যায়, কুরআনের মাস রমযান। মহান আল্লাহ রমযান মাসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

> অর্থ : রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।[২৯]

রমযানে আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষভাবে দুটি জিনিস দিয়েছেন। ১. রোযা। ২. কুরআন। যাদের সামান্যতমও ঈমানের অনুভূতি আছে, তারা প্রত্যেকেই রমযানে রোযা রাখে। কিন্তু রমযান জুড়ে কুরআন তিলাওয়াতকারী রোযাদারের সংখ্যা হাতেগোনা। রমযানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক এতটা সুনিবিড় যে, মহান আল্লাহ কুরআন নাযিলের জন্য এ মাসকেই নির্বাচন করেছেন। রোযার সাথেও কুরআনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন রোযা ও কুরআন এ দুটি আমল বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।[30]

এ জন্য রমযানে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও সুনিবিড়

২৯. সূরা বাকারা, ১৮৫

30. মুসনাদে আহমাদ, ৬৬২৬

করতে হবে। রমযান জুড়ে আমরা প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত তো করবই, চেষ্টা করব কুরআন খতম করার। পাশাপাশি আশপাশের মানুষদের নিয়ে কুরআনের হালাকাও করতে পারি। রমযানে প্রত্যেক মুমিনের বাসায় কুরআনের তিলাওয়াত ধ্বনিত হওয়া উচিত। কর্মব্যস্ততা বা উদাসীনতার কারণে আমরা অধিকাংশ মানুষই এগারো মাস কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি না। তাদের জন্য কমপক্ষে কুরআন নাযিলের এ মাসে কুরআনকে আঁকড়ে ধরা উচিত। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, সে মাসেও যদি আমরা কুরআন থেকে দূরে থাকি, তবে আমাদের চেয়ে হতভাগা আর কেউ হবে না।

সালাফে সালেহীন অর্থাৎ ইসলামের সোনালি যুগের স্বর্ণমানবগণ রমযানে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতেন কুরআন নিয়ে। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম কাতাদাহ (রহ.) সারা বছর সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। রমযানে তিনি প্রতি তিন দিনে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

১৮. কুরআন পরস্পরকে শোনানো ও বুঝে পড়া

রমযান মাসে কুরআন শোনাশুনি করা সুন্নাহ। হাদিসে এসেছে, রমযানের প্রতি রাতে জিবরাইল (আ.) রাসুল (সা.)-এর কাছে আসতেন এবং দুজন কুরআন শোনাশুনি করতেন।[31]

অতএব, রমযান মাসে এ সুন্নাহর ওপরও আমল করা চাই। স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে কুরআন শোনাতে পারেন। আবার পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, অফিসের সহকর্মী কিংবা মসজিদের মুসল্লি, যার সঙ্গে আপনার ভালো সম্পর্ক আছে, তার সঙ্গেও আপনি কুরআন শোনাশুনি করতে পারেন।

তিলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআন বোঝা এবং কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করারও রয়েছে অনেক গুরুত্ব। মহান আল্লাহ্ বলেন:

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ

অর্থ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না?[32]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

অর্থ : এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।[33]

---

31. সহিহ বুখারি, ৬
32. সূরা নিসা : ৮২
33. সূরা সোয়াদ, ২৯

অতএব, রমযান মাসে কুরআন বোঝারও চেষ্টা করা উচিত। যারা আরবি ভাষা জানেন না, তারা কুরআনের বাংলা তরজমা ও তাফসির পড়েও কুরআন বোঝার চেষ্টা করতে পারেন। কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিলকৃত বান্দার প্রতি বিশেষ বার্তা বা চিঠি। জীবন চলে যায় অথচ সেই চিঠি খুলে দেখার কিংবা বুঝে পড়ার ফুরসত আমাদের অনেকের হয় না। বহুলপরিচিত কিংবা প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা যদি কোনো চিঠি পাই, সেই চিঠি নিয়ে আমাদের আগ্রহ ও ব্যাকুলতার শেষ থাকে না। চিঠিটা আমরা বারবার পড়ি, গৌরব করি, অন্যদের কাছে আলোচনা করি। আবার সেই চিঠির ভাষা যদি না বুঝি, তবে যারা বোঝে তাদের কাছে চিঠি নিয়ে দৌড়ে যাই, চিঠির পাঠোদ্ধার করি। পার্থিব জগতের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির চিঠির ব্যাপারে আমাদের এত আগ্রহ, অথচ যিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন, চমৎকার একটি জীবন দিলেন, অমূল্য নেয়ামতে চারপাশ ভরিয়ে তুললেন, সেই সত্তার চিঠিখানা সারা জীবনে একবার বুঝে পড়ার সৌভাগ্যও হলো না। বিচারের দিন মহান আল্লাহ যদি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, লজ্জায় আমাদের মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে?

১৯. দান-সদাকা করা

রমযান মাস যেহেতু ফযিলতপূর্ণ মাস, তাই এ মাসে অন্যান্য আমলের মতো দান-সদাকার ফযিলতও বেশি। রাসুল (সা.) সারা বছর দান-সদাকা করতেন। তার কাছে এসে কেউ খালি হাতে ফেরত যেত না। এরপরও যখন রমযান উপস্থিত হতো, তিনি দান-সদাকার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

অর্থ : আল্লাহর রাসুল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমযানে তিনি সর্বাধিক দানশীল হয়ে উঠতেন, যখন জিবরাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাইল (আ.) তার সাথে দেখা করতেন এবং তারা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল (সা.) প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন।[34]

দান একটি বিশেষ আনন্দময় ও সহজ ইবাদত। আনন্দময় এ কারণে, এর মাধ্যমে অন্তর প্রশান্ত হয়। আবার অনেক সময় যাকে দান করা হয়, তার প্রাপ্তির হাসি সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায়। দানকারীর জন্য এটা অবশ্যই আনন্দের বিষয়। আর সহজ এ কারণে, এতে শুধু অর্থ ব্যয়

---

34. সহিহ বুখারি, ৬

হয়; এর জন্য বিশেষ পরিশ্রম, প্রস্তুতি বা সময় ব্যয় করতে হয় না। শুধু বিশুদ্ধ নিয়ত এবং উপার্জন হালাল হলেই আশা করা যায়, তার দান আল্লাহ্ কবুল করে নেন।

আমাদের আশেপাশে অনেক অভাবী মানুষ আছেন। অনেকে অন্যের কাছে হাত পাততে পারেন না। অনেকে অর্থের অভাবে পুষ্টিকর খাবার জোগাড় করতে পারেন না। রমযানে সেসব মানুষের বাসায় মাছ, মাংস, খাদ্যসামগ্রী কিংবা অন্য কোনো উপহার বা সহায়তা পাঠানো এ মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল হতে পারে।

রমযানসহ রাসুল (সা.)-এর সারা জীবনের সঙ্গী ছিল দান-সদাকা। দান মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ সুগম করে। সুতরাং রাসুল (সা.)-এর অনুসরণে এবং নাজাতের মাসে নাজাত তরান্বিত করতে অধিক পরিমাণে দান-সদাকা করা উচিত।

২০. তাহাজ্জুদ ও ভোর রাতের দোয়া

তাহাজ্জুদ মুমিনের মর্যাদার সোপান, আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম এবং আল্লাহর প্রিয় হওয়ার গোপন সিঁড়ি। ফরজ সালাতের পর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামাজ তাহাজ্জুদ। রাতে ঘুম থেকে জেগে যে সালাত আদায় করা হয় সেটাকে তাহাজ্জুদ বলে। তাহাজ্জুদ একমাত্র নফল সালাত যার নির্দেশ কুরআনে দেওয়া হয়েছে:

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

> অর্থ : রাতের কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ পড়বে, যা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত।[৩৫]

তাহাজ্জুদ ছিল রাসুল (সা.)-এর জীবনের চিরসঙ্গী। ইসলামের প্রথম দিকে মক্কার জীবনে তিনি এত দীর্ঘ সময় নিয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন, তার পা ফুলে যেত। তাহাজ্জুদের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উত্তম সালাত হলো গভীর রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাত।[৩৬]

দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে সবচেয়ে স্নিগ্ধ ও পবিত্র মুহূর্ত হলো শেষ রাত। এ সময় সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে থাকে অথচ মহান আল্লাহ বান্দার দোয়া কবুলের জন্য এ সময় প্রথম আসমানে অবতরণ করেন। তিনি চান, এই পবিত্র মুহূর্তে বান্দা তার সকল অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনা আল্লাহর কাছে পেশ করুক আর আল্লাহ তার সকল প্রার্থনা কবুল করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং দোয়া কবুল করিয়ে নেওয়ার এই অপূর্ব সুযোগ আমরা হেলায়

---

৩৫. সূরা ইসরা, ৭৯

৩৬. সহিহ মুসলিম, ১১৬৩

হারিয়ে ফেলি। আমাদের অভাব-অভিযোগ শুনবার জন্য আল্লাহ যখন আমাদের ডাকেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ঘুমিয়ে থাকি। সারা বছর উদাসীন থাকলেও রমযানে এই অপূর্ব সুযোগ হেলায় হারানো উচিত নয়। কারণ, অধিকাংশ রোযাদারকেই সাহরির জন্য শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠতে হয়। আমরা যদি একটু বেশি সময় হাতে নিয়ে ঘুম থেকে উঠি আর সাহরির আগে-পরে তাহাজ্জুদ ও দোয়ায় মগ্ন থাকি, তবে আমাদের রমযান আরও বেশি সার্থক হয়ে উঠবে।

আবার আমাদের সমাজে শেষ রাতে সাহরি পার্টি নামে নব্য এক সংস্কৃতি চালু হয়েছে। যে সময়টায় নীরবে-নিভৃতে দোয়া ও একান্ত ইবাদতে কাটানোর কথা, সে সময় বন্ধু-বান্ধবের আসর, আনন্দ-ফূর্তি; এমনকি সাহরি পার্টির নামে যুবক-যুবতীদের আড্ডা নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে সকল অপসংস্কৃতি থেকে হেফাজত করুন।

২১. উমরাহ করা

উমরাহ ইসলামের একটি বিশেষ ইবাদত। নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরামের নিয়ত করে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ-সহ কয়েকটি বিশেষ আমলের নাম উমরাহ। দুই উমরাহর মাঝের সকল সগিরা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় বলে হাদিসে সুসংবাদ এসেছে। উমরাহ যে কোনো সময় করা গেলেও রমযানের উমরাহর রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য। প্রত্যেক সামর্থ্যবানদের রমযান উপলক্ষ্যে উমরাহ করার চেষ্টা করা উচিত। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:

عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

| অর্থ : রমযানের একটি উমরাহ একটি হজের সমতুল্য।[৩৭] |

অনেকের উমরাহ করার সামর্থ্য আছে, কিন্তু হজ করার সামর্থ্য নেই। তারা রমযানে উমরাহ পালন করে এই হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী হজের সওয়াব লাভ করতে পারেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, রমযানে উমরাহ করা আমার সঙ্গে হজ করার সমতুল্য।

প্রিয় নবীজির (সা.) সঙ্গে হজের মহাসৌভাগ্য—কে না চায়! কিন্তু আমরা চাইলেই কি এ যুগের মানুষ হয়ে দৈহিকভাবে রাসুলের (সা.) সঙ্গে হজ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব? পারব না। তবে আত্মিক ও মর্যাদাগতভাবে সেই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে। আর তা হলো রমযানের উমরাহ। রমযানে উমরাহ করার মাধ্যমে রাসুলের (সা.) সঙ্গে হজ করার এক বিরল মর্মীয় সৌভাগ্য আমরা লাভ করত পারি।

---

৩৭. সহিহ বুখারি, ১৭৮২; সুনান ইবনে মাজাহ, ২৯৯৪

তাছাড়া রমযান গুনাহ মাফ ও দোয়া কবুলের মাস। রমযানে উমরাহ করলে দোয়া কবুলের এমন বিশেষ কিছু উপলক্ষ্য তৈরি হয়, যে উপলক্ষ্য উমরাহর বাইরে আসে না। সুতরাং যাদের সামর্থ্য আছে তাদের এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। আর যাদের সামর্থ্য নেই তাদের উচিত সামর্থ্য লাভের দোয়া করা এবং রমযানে উমরাহ আদায়ের স্বপ্ন লালন করা। এর মাধ্যমে উক্ত ফযিলতের ভাগীদার হওয়ার পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ।

২২. ইতিকাফ করা

ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করাকে ইতিকাফ বলে। ইতিকাফ মাহে রমযানের কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের একটি। আল্লাহর ক্ষমা ও নৈকট্য লাভের সর্বোচ্চ চেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো রমযানের শেষ দশকের ইতিকাফ। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি বছর রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।[38]

শুধু তাই নয়, ইতিকাফ রাসুল (সা.)-এর কাছে এতটাই প্রিয় ছিল, এক বছর বিশেষ কারণে ইতিকাফ ভঙ্গ করে তাকে মসজিদ থেকে বের হতে হয়েছিল বলে পরের বছর তিনি দশ দিনের পরিবর্তে বিশ দিন ইতিকাফ করেন।[৩৯]

রমযানের শেষ দশকের ইতিকাফ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, পুরো রমযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফযিলতপূর্ণ সময় হলো রমযানের শেষ দশক। আর ইতিকাফের মাধ্যমে শেষ দশকের ফযিলত সহজেই লাভ করা যায়। কেননা, ইতিকাফ মানে হলো সংসারের যাবতীয় ব্যস্ততাকে ছুটি দিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে বন্দি করে ফেলা। এর ফলে ইতিকাফকারী দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর ঘর মসজিদে অবস্থান করেন। এই দিনগুলোতে তিনি যদি বিশেষ কোনো আমল নাও করেন, তবু ইতিকাফের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাটাই তার বড় ইবাদত। তাছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, যারা ইতিকাফ করেন, তারা এই পুণ্যময় দিনগুলো অবহেলায় কাটান না। তাদের তাকবিরে উলা কখনো ছুটে যায় না। তারা দশদিন নিয়মিত

---

38. সহিহ বুখারি, ২০২৬

৩৯. সুনান আবু দাউদ, ২৪৬৬ ; সুনান ইবনে মাজাহ, ১৭৭০

তাহাজ্জুদ আদায় করেন। রোযা রেখে দিনভর মসজিদে অবস্থান করার কারণে নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর জিকিরে তাদের সময় অতিবাহিত হয়। একসঙ্গে এতগুলো ইবাদতের সহজ সুযোগ ইতিকাফহীন মানুষের জীবনে সাধারণত আসে না। এ কারণেই রমযানের শেষ দশকের ইতিকাফ এত অনন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, প্রতি বছর আমাদের জীবনে যে ইতিকাফের আগমন ঘটে সৌভাগ্যের পরশমণি হয়ে, সেই ইতিকাফ রমযানের সবচেয়ে অবহেলিত আমলগুলোর একটি। এদেশের অধিকাংশ মসজিদে ইতিকাফের জন্য মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো এলাকায় অর্থের বিনিময়ে ইতিকাফের জন্য লোক ভাড়া করতে হয়। ব্যাপার যেন এমন, আল্লাহ রমযানের শেষ দশকে অনেক নেকি দেবেন, কিন্তু আমাদের তো সেই নেকি গ্রহণের সময় নেই, আপনি কিছু টাকার বিনিময়ে আমাদের মসজিদে বসে সেই নেকিগুলো গ্রহণ করুন। এটা যে কতবড় গর্হিত কাজ, তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। ইতিকাফ একটি ইবাদত। এর বিনিময় দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি হারাম। যে আমলটি প্রিয় নবী (সা.) জীবনে কখনো ছাড়েননি, আমরা অধিকাংশ মানুষ সেটা জীবনে একবারও করিনি। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আর কী হতে পারে!

ইতিকাফ এমন একটি আমল, যার তৃপ্তি ও আনন্দ বর্ণনাতীত। এর মাধ্যমে অপার্থিব এক সুখের পরশ ইতিকাফকারী আপন হৃদয় দ্বারা অনুভব করেন। এ জন্য কেউ একবার ইতেকাফ করলে তাকে প্রতি বছর ইতিকাফের জন্য ব্যাকুল থাকতে দেখা যায়।

সারা বছর পার্থিব নানা ব্যস্ততায় আমরা ইবাদতে পূর্ণ মনযোগ দিতে পারি না। সেই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে বছরের দশটি দিন আমরা মসজিদে বন্দি হয়ে যেতে পারি। রমযানে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এর চেয়ে উত্তম বিকল্প আর কিছু হতে পারে না।

২৩. শেষ দশকে ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া এবং রাত্রি জাগরণ

বছরের শ্রেষ্ঠ মাস রমযান আর রমযানের শ্রেষ্ঠ দশক শেষ দশক। রাসুল (সা.) সারা বছরই ইবাদতের ভেতর কাটাতেন। তারপরও রমযানের শেষ দশক এলে তিনি ইবাদত-বন্দেগি বাড়িয়ে দিতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) রমযানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য এত বেশি সাধনা-পরিশ্রম করতেন, যা অন্য কোনো সময় করতেন না।[40]

তাই রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগিতে মনোনিবেশ করা সুন্নাহ। এটা রমযানের বিশেষ কর্মসূচি। অথচ আমাদের জীবনে উল্টো চিত্র দেখা যায়। আমরা অধিকাংশ মানুষ রমযানের শুরুর দিকে ইবাদতের প্রতি মনোযোগী থাকলেও শেষে এসে আমাদের দম ফুরিয়ে যায়। আমরা ঈদের কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ঈদের ছুটিতে শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার তোড়জোড়ে আমরা ভুলে যাই, কী এক সৌভাগ্যের মুহূর্ত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে! অথচ রমযানের শেষের এই দিনগুলো হলো রমযানের শ্রেষ্ঠাংশ। তাই রমযানের শেষ দিনগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সেই সাথে শেষ দশকের প্রত্যেক রাতেই জেগে থেকে ইবাদতে মগ্ন থাকার চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহর রাসুল (সা.) রমযানের শেষ দশকে রাত জেগে আমল-ইবাদতে মশগুল থাকতেন।[41]সুতরাং রমযানের শেষ দশ রাত ইবাদতের উদ্দেশ্যে জেগে কাটানো কিংবা বেশিরভাগ সময় জেগে থাকা একটি

40. সহিহ মুসলিম, ১১৭৫

41. সহিহ বুখারি, ২০২৪

স্বতন্ত্র সুন্নাহ। আমরা অনেকে চাইলে দিনে সুবিধা মতো ঘুমিয়ে রাতভর বা রাতের অধিকাংশ সময় সালাত, তিলাওয়াত, দোয়া ও তাসবিহ ইত্যাদিতে মগ্ন থাকতে পারি। পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য কত কষ্টই না আমরা করি। অনন্তকালের সুখের ঠিকানা জান্নাত লাভের জন্য বছরের দশটি রাত জেগে থাকা কি সে তুলনায় বেশি কিছু?

২৪. শেষ দশকে পরিবারকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা এবং স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ

রমযানের শেষ দশকে নিজে রাত জেগে ইবাদত করা যেমন সুন্নাহ, আবার পরিবার-পরিজনকে ইবাদতের জন্য ঘুম থেকে ডেকে তোলাও সুন্নাহ। আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি (সা.) রমযানের শেষ দশকে পরিবারকে (ইবাদত-বন্দেগির জন্য) ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন।[42]

রমযানের শেষের রাতগুলোর মর্যাদা এত বেশি এবং এ সময়ে অকাতরে এত বেশি মাগফিরাত ও নাজাত বিতরণ হয় যে, পরিবারের সদস্যরা সেটা থেকে বঞ্চিত হবে, রাসুল (সা.) তা মেনে নিতে পারতেন না। সেজন্য শেষ দশকে তিনি নিজে রাত্রিজাগরণ করতেন, পরিবারকেও ঘুম থেকে ডেকে তুলে ইবাদতের জন্য উৎসাহ দিতেন। শুধু তাই নয়, রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের পূর্ণ সুফল পেতে প্রিয় নবী (সা.) রমযানের শেষ দশক শুরু হলে 'কোমর বেঁধে নিতেন' বলে আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন, এর অর্থ হলো রাসুল (সা.) শেষ দশকে স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করতেন। তাছাড়া কোমর বেঁধে নেওয়ার অর্থ আমরা পূর্ণোদ্যমে ইবাদতে মনোনিবেশ করাও বুঝি। তাই রাসুল (সা.)-এর অনুসরণে রমযানের শেষ দশদিন সংসারের যাবতীয় ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণোদ্যমে আমাদের ইবাদতে মগ্ন হওয়া রমযানের অন্যতম করণীয়।

42 . মুসনাদে আহমাদ, ৭৬২

২৫. লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা

বছরের শ্রেষ্ঠ মাস রমযান আর বছরের শ্রেষ্ঠ রাত লাইলাতুল কদর। এ রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। এ রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। মহান আল্লাহ লাইলাতুল কদরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

| অর্থ : কদরের রাত হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ।[43] |

অর্থাৎ, এক হাজার মাস ইবাদত করলে যে সওয়াব হয়, লাইলাতুল কদরে এক রাত ইবাদত করলে তার থেকে বেশি সওয়াব হয়। উম্মতের জন্য এটা যে কতবড় সুযোগ, আমরা যদি তা মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করতাম, তবে এই রাতটি পাওয়ার জন্য সারা বছর অপেক্ষা ও পরিশ্রম করতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমরা অধিকাংশ মানুষই লাইলাতুল কদরের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারি না। ফলে প্রতি বছর আমাদের অনেকের জীবন থেকে এমন অবস্থায় লাইলাতুল কদর বিদায় নেয়, যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি। এরচেয়ে আফসোসের বিষয় আর কী হতে পারে!

রমযানের যে কোনো রাত লাইলাতুল কদর হতে পারে। তবে রমযানের শেষ দশকে, বিশেষ করে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর কোনো একটিতে লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

43. সূরা কদর, ৩

অর্থ : তোমরা রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ করো।[44]

এ জন্য লাইলাতুল কদরে ইবাদতের মর্যাদা পেতে রমযানের শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই ইবাদত করতে হবে, বিশেষ করে বিজোড় রাতগুলোয়। একবার লাইলাতুল কদরে ইবাদতের সৌভাগ্য হলে তার বিনিময়ে যে সওয়াব ও মর্যাদা লাভ হবে, তা হাজার মাস ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান হবে। এই অপূর্ব সুযোগ হেলায় হারানো কোনো বুদ্ধিমান মুসলমানের কাজ হতে পারে না।

44 সহিহ বুখারি, ২০২০

২৬. লাইলাতুল কদরের বিশেষ দোয়া

পূর্বের আলোচনায় আমরা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জেনেছি। কথা হলো, কেউ যদি লাইলাতুল কদর পেয়ে যায়, তবে সে রাতে বিশেষ কোনো দোয়া আছে কি না? হ্যাঁ, অন্যান্য সাধারণ ইবাদতের পাশাপাশি এ রাতের জন্য রাসুল (সা.) বিশেষ একটি দোয়া শিখিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি জানতে পারি কোন রাত লাইলাতুল কদর, তবে সে রাতে কী দোয়া করব? রাসুল (সা.) বললেন, তুমি বলবে,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

> অর্থাৎ, হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।[৪৫]

যেহেতু শেষ দশকের যে কোনো রাতই লাইলাতুল কদর হতে পারে; বিশেষ করে বিজোড় রাতগুলো, তাই সাধারণভাবে সেসব রাতগুলোতে উক্ত দোয়া নিবেদন করা সুন্নাহ। আর যদি কোনো রাতে কদরের রাতের আলামত দেখা যায় এবং লাইলাতুল কদর বলে প্রবল ধারণা হয়, তবে সে রাতে দোয়াটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে পাঠ করতে হবে।

৪৫. সুনান তিরমিযি, ৩৫১৩

২৭. ফিতরা আদায় করা

রোযার পর আসে মুসলমানদের আল্লাহপ্রদত্ত উৎসব ঈদ। রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ এবং ঈদের উৎসবে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সদকাতুল ফিতরের ব্যবস্থা রেখেছে। সদকাতুল ফিতর বা ফিতরা ধনীদের তরফ থেকে দরিদ্রদেরকে দিতে হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রমযান মাসজুড়ে সিয়ামরত অবস্থায় যেসব ভুল-বিচ্যুতি হয় সেসবের কাফফারা এবং দরিদ্রদের খাদ্য যোগানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল (সা.) সদাকাতুল ফিতর ধার্য করেছেন।[৪৬]

ফিতরা ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) ঈদের সালাতের উদ্দেশে বের হওয়ার আগে ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৭]

অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম ঈদ আসার দু-এক দিন আগেও ফিতরা আদায় করেছেন। এ জন্য ঈদের দু-এক দিন আগেও ফিতরা দেওয়া যাবে। ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে যেমন দিতে হবে, তেমনই পরিবারের সকল সদস্য; এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং অধীনস্থ একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকেও দিতে হবে।

৪৬. সুনান আবু দাউদ, ১৬০৯

৪৭. সহিহ বুখারি, ১৫০৯

রমযানের দিনগুলোকে সার্থক করতে আমাদের প্রয়াস

- তারবীহর সালাতে কুরআনের বার্তা
- রমাদান প্ল্যানার
- মাহে রমযানের ২৭ আমল

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন
উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে
+8809610-001089 assunnahfoundation.org